Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 111-116
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অশোকবিজয় রাহার জীবনে রবীন্দ্র-প্রভাব

মৌসুমি বণিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Ashokbijay Raha was one of the poets of Post- Tagore era upon whom the influence of Tagore was reflected much. The base of his poetic mind was made through the poems of Tagore. But he did not enrol his name in the list of Tagore's followers. Ashokbijay created his own poetic world independently though there was always Rabindranath in his mind throughout his life. He was born in Dhaka Dakshingram in Sylhet district of Bangladesh on 14th November 1910. He was born and brought up in the hilly areas. In his childhood, he was introduced with Tagore through his poems. After that he sent many of his own poems to Tagore and got blessings and appreciations from Tagore. The love for Tagore was seen by celebrating the birthdays of Tagore and through other cultural activities. Ashokbijay had written many poems, essays taking Tagore as the subject of his writings. He also delivered speech on Rabindranath in abroad. When he was a Professor at Visva-bharati, there also his subject of teaching was Tagore. He was totally an admirer of Tagore. The main purpose of this article is to focus on how the influence of Tagore came into flash in both the personal and poetic life of Ashokbijay Raha.

Key Words: Tagore, Ashokbijay, Influence, Mindset, Poetic thought.

অশোকবিজয় রাহার জীবন ও সাহিত্যিক মননের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। কবি অশোকবিজয় স্কুলে পড়ার সময় শুরুর দিকে কবিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। কবিতার প্রতি সেই অনীহার কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

> *"ছেলেবেলায় ছড়ার প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল প্রবল। কিন্তু ইস্কুলের নিচের ক্লাসগুলোতে পড়বার সময় কী যে হয়ে গেল বুঝতে পারি নে। কবিতার প্রতি আমার মন এত বিরূপ হল যে বলবার নয়।"* [১]

কবিতার প্রতি বিরূপতার কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন স্কুলের পাঠ্য বইয়ের অন্তর্গত কবিতার জড়তা ও আড়ষ্টতার কথা। তাছাড়া আরণ্যক পরিবেশে লালিত তাঁর মুক্ত মন স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল গদ্যের দিকে। কবিতার প্রতি এই বিরূপতার অবসান ঘটে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ফুলের ফসল' কাব্যটির সঙ্গে পরিচয় হবার পর। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা সন্ধান করতে গিয়ে লাইব্রেরিতে 'প্রবাসী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি তাঁর নজর পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথকে খুঁজতে গিয়ে এভাবেই তাঁর প্রথম পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কবিতার প্রতি ভালোলাগা ধীরে ধীরে ভালোবাসায় পরিণত হয়। সদ্য জেগে ওঠা এই কাব্যপ্রীতি শুধু কাব্যপাঠে সীমাবদ্ধ

রইল না; তিনি নিজেও কবিতা লেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। কবিতা বিমুখ অশোকবিজয়ের এভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সূত্রেই কাব্যজগতে প্রবেশ ঘটে। একদিকে কবিতা রচনা অন্যদিকে রবীন্দ্রথের 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'সাজাহান', 'বলাকা', 'পুরস্কার' প্রভৃতি কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। তরুণ বয়সেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন।

১৯৩১ সালে প্রথম রবীন্দ্র-দর্শনের অনেক আগেই অশোকবিজয়ের কবিতা পৌঁছে গিয়েছিল কবির হাতে। ১৯২৯-এ অশোকবিজয়ের বয়স যখন উনিশ, তখন তাঁর সহপাঠি বন্ধু রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী শান্তিনিকেতনে যান। যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যান অশোকবিজয়ের লেখা পনেরোটি কবিতা। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ আদৌ পড়ে দেখবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল তাঁর মনে। এই সন্দেহের কথা রয়েছে অশোকবিজয়ের পত্র সংকলনের অষ্টম পত্রে। বন্ধু জগদীশ ভট্টাচার্যকে লেখা এই পত্রে তিনি জানিয়েছেন,

> *"কিন্তু কী আশ্চর্য! আমার পার্বত্য জীবনের অরণ্যস্বাদে ভরা সেই একগুচ্ছ কবিতা পড়ে কবি খাতার উপরে স্বহস্তে লিখে দিলেন তাঁর 'অকুণ্ঠিত' প্রশংসাবাণী। কবির স্বাক্ষরের তারিখটি ছিল ১০ পৌষ, ১৩৩৬। শ্রীহট্টে ফিরে গিয়ে বন্ধুটি যখন আমার সামনে তুলে ধরলেন রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তখন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না নিজের চোখকে। তোমাকে আগের চিঠিতেই লিখেছি এর চেয়ে বড়ো আনন্দ কোনো দিন পাইনি আমার জীবনে। কবির দর্শন লাভের পরে আরো দু'বারই পেয়েছি তাঁর আশীর্বাদঃ একবার কবিতায় (২২ ফাল্গুন, ১৩৩৮) এবং গদ্যে (৪ঠা কার্তিক, ১৩৩৯)-তা হলেও প্রথমবারের সৌভাগ্য ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত।"*[২]

কবির মনে সবথেকে বেশি দাগ কেটেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠিটি। 'পার্বত্য জীবনের অরণ্যস্বাদে ভরা' অশোকবিজয়ের কবিতাগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। তাঁর ভালো লাগার কথা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতার খাতার ওপর লেখেন,

> *"তোমার কবিতাগুলিকে অকুণ্ঠিত মনে ভালো বলিতে পারিলাম। ইহার মধ্যে কেবল লেখার নৈপুণ্য নহে কবিতার পরিচয় পাইলাম।"*[৩]

এই 'আশীর্বাণী' উনিশ বছরের অশোকবিজয়ের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। এর দুবছর পর ১৯৩১-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অশোকবিজয়ের প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁর বয়স একুশ। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে শ্রীহট্ট শহরে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদের প্রতিনিধি রূপে অশোকবিজয় কলকাতায় আসেন। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনের দ্বিতলে কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অশোকবিজয় কবির হাতে তুলে দেন একটি মানপত্র, 'দুর্গতদের দুঃখহরণে'র জন্য 'যৎকিঞ্চিত দক্ষিণা' ও 'জয়ন্তী- পরিষদে'র সভাপতি অধ্যাপক নলিনীমোহন শাস্ত্রীর একটি চিঠি। এছাড়া কবির উদ্দেশে লেখা অশোকবিজয়ের একটি দীর্ঘ কবিতা 'নমস্কার' কবির হাতে তুলে দেওয়া হয়। শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তীতে ১৯৩১-এর ২০ ডিসেম্বর রবিবার অশোকবিজয় এই কবিতাটি পাঠ করেন।

১৯৩১-এ অশোকবিজয়ের আর একগুচ্ছ কবিতার পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছায়। এই কবিতাগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ আগের মতো খাতায় কোন মন্তব্য লেখেননি। পরিবর্তে তিনি চার ছত্রের একটি কবিতা আশীর্বাদ হিসাবে অশোকবিজয়কে পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটি ছিল এইরকম,

"আকাশে চেয়ে আলোকবর
মাগিল যবে তরুণ চাঁদ
রবির কর শীতল হয়ে
করিল তারে আশীর্বাদ।"[৪]

১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ প্রকাশিত 'যেথা এই চৈত্রের শালবন' কাব্যগ্রন্থের সূচনায় এই কবিতাটি যুক্ত করে তার নিচে অশোকবিজয় লিখেছেন,

"তিরিশ বছর আগে রেখেছিলে তোমার স্বাক্ষর
তিরিশ বছর ধরে আমি তাকে রেখেছি অন্তরে,
আজ এই নিস্তব্ধ প্রহরে
গভীর নিশীথে
আকাশের নক্ষত্রলিপিতে
জ্বলে তার প্রতিটি অক্ষর।।" [৫]

১৯৩২ সালে আরো একবার অশোকবিজয় তাঁর একগুচ্ছ কবিতা পাঠান রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর পাণ্ডুলিপির খাতার উপর একটি আশীর্বাণী লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ,

"তোমার কবিতাগুলির অনেকগুলি আমার ভালো লাগিল। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।" [৬]

এভাবে বারে বারে অশোকবিজয় তাঁর কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে উৎসাহ ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। একজন তরুণ উঠতি কবির জন্য রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি সবথেকে বড়ো পুরস্কার। রবীন্দ্র-স্বীকৃতি অশোকবিজয়কে সবসময় আনন্দ দিয়েছে। এইসব আশীর্বাণী ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। দুর্ভাগ্যবশত সেই কবিতাটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। অশোকবিজয়ের পত্র সংকলন 'পত্রাষ্টকে'র একটি চিঠিতে সেই আক্ষেপ ধরা পড়েছে,

"একটা সত্যিকারের দুঃখ রয়ে গেল আমার জীবনে। কবি অমিয় চক্রবর্তী তখন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। সময়টা বোধ করি ১৯৩২ সাল। অমিয়বাবুর একখানা চিঠি থেকে জানতে পেরেছিলাম রবীন্দ্রনাথ না-কি একটি চমৎকার কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু ডাকের গোলযোগের জন্যেই হোক সে-কবিতা কোনোদিন পৌঁছয় নি আমার হাতে।" [৭]

শুধুমাত্র কাব্যচর্চা বা শিক্ষকতা নয়, শ্রীহট্টে থাকার সময় অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অশোকবিজয়। এই সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। ১৯৩২ সালের শেষদিকে শান্তিনিকেতনের আদর্শে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েছিলেন অশোকবিজয়। এ বিষয়ে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন একান্ত সচিব কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী অশোকবিজয়কে একটি চিঠি দেন। অশোকবিজয়ের প্রচেষ্টাকে বিশ্বভারতী কীভাবে দেখেছিল তার প্রমাণ রয়েছে সেই চিঠিতে। অমিয় চক্রবর্তীর চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করলেই তা স্পষ্ট হবে,

"প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠিখানি পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। কবি এবং রথিবাবু দেখিয়াছেন, এবং পরে বিশেষ কমিটি আহ্বান করিয়া এই পত্রের বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীহট্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশ্বভারতীর বিষয়ে যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের সকলেরই মনে বিশেষ আশা এবং অনুপ্রেরণা জাগিয়াছে।...

শ্রীহট্টে আপনারা নিজেদের চেষ্টায় বিশ্বভারতীর আদর্শ-বিস্তারের জন্য ছোট একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ভাবের প্রচার এবং আনুকূল্য সঞ্চার করিতে পারেন তো তাঁহার চেয়ে মঙ্গলময় কিছুই হইতে পারে না।...

এখান হইতে যোগরক্ষার জন্য আমাদের যাহাই করিতে বলিবেন সানন্দে করিব।...

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী" [৮]

১৯৩২-এ অশোকবিজয় প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন উত্তরায়ণের কোণার্ক-এ। ওই সময় তিনি প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন।

শ্রীহট্টে থাকাকালীন অধ্যাপক হিসেবে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন অশোকবিজয়। করিমগঞ্জ কলেজে এসেও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯৫১ সালে তিনি বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। শান্তিনিকেতনে বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান তিনি। বিভিন্ন সময়ে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। এই সময়ে তিনি রবীন্দ্র-বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয় 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা'র দ্বিতীয় খন্ড। রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে 'সম্মেলনের কার্যবিবরণী'র চতুর্থ খন্ডটিও তিনি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে তাঁকে। ১৯৬৬ সালে 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু অ্যাওয়ার্ড কমিটি'র আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিরূপে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন। মস্কোর 'ফ্রেন্ডশিপ হাউসে' তিনি 'রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর কবিতা রচনার প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ থেকে শুরু করে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হিসেবে রবীন্দ্র-সংক্রান্ত নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তবে একটি বিষয় তাঁকে আহত করেছিল। সেটি হলো রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর শ্রীহট্টের বাণীচক্র ভবন থেকে ১৯৪১-এ কবির স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য প্রকাশিত একটি বইয়ে তাঁর অনুপস্থিতি। বইটির নাম 'কবি-প্রনণাম'। এর সম্পাদক হিসেবে ছিলেন নলিনীকুমার ভদ্র, অমিয়াংশু এন্দ, মৃণালকান্তি দাশ ও সুধীরেন্দ্রনাথ সিংহ। প্রায় তিরিশজন খ্যাতনামা লেখকের কবিতা ও প্রবন্ধ এতে জায়গা করে নিয়েছে। শ্রীহট্টের দুজন কবির কবিতাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য প্রতিষ্ঠিত কবি অশোকবিজয়ের কোনো রচনা সংকলনটিতে অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতি কবিকে কতখানি আহত করেছিল তা জগদীশ ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র থেকেই বোঝা যায়। 'কবি-প্রণাম' প্রকাশকালে ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে কবি-বন্ধু জগদীশ ভট্টাচার্যকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন অশোকবিজয়। সেই পত্রের কিছু অংশ তুলে ধরে কবির মনোভাব বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে,

বিষ্ণুপুর ভবন
মীরাবাজার, শ্রীহট্ট
৬-১২-১৯৪১

"জগদীশবাবু,

আপনার পত্রখানি আমাকে বড়ো শান্তি দিয়াছে। হৃদয়ের ক্ষতস্থানে একখানি প্রিয় হাতের এমন সুকোমল স্নেহস্পর্শ বহুদিন পাই নাই। পত্রের আরম্ভে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমার চিরজীবনের সান্ত্বনা হইয়া রহিল—ইহার অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।... আপনার ভালোবাসাই আপনাকে ধ্রুবজ্যোতিতে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।" [৯]

পত্রের আরম্ভে কবি কথিত 'হৃদয়ের ক্ষতস্থান' সহজেই বোধগম্য। বোঝাই যাচ্ছে পত্রটি জগদীশ ভট্টাচার্যের পত্রের প্রত্যুত্তরে লেখা। জগদীশ ভট্টাচার্যও কবির অন্তরের ব্যথাকে সহজেই অনুভব করেছিলেন এবং উপযুক্ত সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও করেছেন। এই পত্রের ছয় নম্বর পৃষ্ঠায় অশোকবিজয় লিখেছেন,

"বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের উপরে সার্থক কবিতা লেখা এক অসম্ভব ব্যাপার। আমি সত্যই আজ পর্যন্ত মনের মধ্যে এতখানি সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই,-- কেবলই ভয় হয়, কেবলই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকি। বেতারে যেদিন মহাকবির তিরোধান-সংবাদ পাইলাম সেদিন বজ্রাহত হইয়াছিলাম। সেদিন সূর্যাস্তবেলার আকাশে কী দেখিয়াছিলাম জানি না; হঠাৎ 'অগ্নি-ঈগল' নাম দিয়া একটি ছোটো বারো পংক্তির কবিতা লিখিয়াছিলাম। ... সর্বশেষে আপনাকে এই ছোটো কবিতাটি শুনাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।... [১০]

পত্রের শেষে অশোকবিজয়ের কবিতাটি স্থান পেয়েছে। 'অগ্নি-ঈগল' পরে অশোকবিজয়ের 'যেথা এই চৈত্রের শালবন' কাব্যে সংকলিত হয়েছে। এই কাব্যে সংকলিত 'সূর্য-বিহঙ্গ', 'পঁচিশে বৈশাখ', 'জন্মদিন-মৃত্যুদিন' প্রভৃতি কবিতাও রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করেই লেখা। এছাড়া, 'নমস্কার' কবিতাটিরও মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ।

অশোকবিজয়ের কবিতা বা অন্য কোনো রচনা 'কবি-প্রণাম' গ্রন্থে জায়গা পায়নি। এই বিষয়টি শুধু কবিকেই বেদনাহত করেনি; ২০১৫ সালে 'কবি-প্রণাম'-এর পুনঃপ্রকাশ যাঁর হাত ধরে সেই বিশিষ্ট লেখক-গবেষক তথা অধ্যাপক উষারঞ্জন ভট্টাচার্যকেও পীড়া দিয়েছে, বিস্মিত করেছে। 'কবি-প্রণাম' যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছিল কবি জগদীশ ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ২০০৪ সালের ৪ জুন এক আলাপচারিতায় জগদীশ ভট্টাচার্যকে 'কবি-প্রণাম' গ্রন্থে অশোকবিজয়ের অনুপস্থিতির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন উষারঞ্জন। জবাবে জগদীশ জানান,

> *"তুমি বলছ দুর্ভাগ্যের, আমি বলি গৌরবের। কেন বলছি বুঝতে পারছ ? আজ তুমি উষারঞ্জন, এত বছর পর তোমার মনে প্রশ্নটা জাগল, সরাসরি তুমি আমাকে প্রশ্ন করলে, এর তাৎপর্য কী ? তাঁর অভাব তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তুমি উত্তরপুরুষ, তুমি তাঁর অনুপস্থিতি মেনে নিতে পারছ না, তোমার মতো আরও কেউ কেউ পারছেন না, বা পারবেন না—এর চেয়ে গৌরবের আর কী আছে কবির বলো ?"* [১১]

যে 'কবি-প্রণাম' গ্রন্থে অশোকবিজয়ের জায়গা হয়নি, সেই গ্রন্থ প্রকাশের পঁচাত্তর বছর পরে এর পুনঃপ্রকাশে উষারঞ্জন ভট্টাচার্য অশোকবিজয়কে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে স্থান করে দিলেন। জগদীশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে অশোকবিজয় সংক্রান্ত আলাপচারিতা, জগদীশ ভট্টাচার্যকে লেখা অশোকবিজয়ের চিঠি ও রবীন্দ্র-প্রয়াণের পরে লেখা অশোকবিজয়ের 'অগ্নি-ঈগল' কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এর থেকে ভালো সমাপতন আর কিছুই হতে পারতো না।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে অশোকবিজয়ের কবিতা লেখার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। তাই কবিতা রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্কুল-জীবনে লেখা প্রথম দিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও খুব দ্রুত সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকে 'গুরু' মনে করলেও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের দলে তিনি নাম লেখাননি। রবীন্দ্রোত্তর যুগের রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত কবি হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় রেখে গেছেন অশোকবিজয়। আর এর পেছনেও রয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই অবদান। অশোকবিজয় জানিয়েছেন,

> *"আমার জন্মগত সংস্কার যা-ই থাক, অন্তরের গভীর প্রত্যয় থেকে বলছি, রবীন্দ্রনাথ আমার গুরু। যথার্থ গুরুর মতোই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন শিষ্যের 'আধার'টি কী, এবং তার নিজের ভাব নষ্ট না করে তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন কাকে বলে বাগর্থের একাত্মতা, এবং কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় শিল্পসৃষ্টির কলাকৌশল। বস্তুত এর পর থেকেই কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে আমার মৌল সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই দুটি বস্তু আমাকে চালিত করে এসেছে আজীবন।"* [১২]

রবীন্দ্রনাথের 'মন্ত্রশিষ্য' হয়েও অশোকবিজয় নিজের জগৎ নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিরুদ্ধতা নয়, তার প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁকে গোত্রে ও ধর্মে 'বিশুদ্ধ কবি' হিসেবে গড়ে তুলেছে। অশোকবিজয়ের কাব্যজগৎ নির্মাণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,

> *"রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করে নয়, সেই মহৎ উত্তরাধিকারকে স্বীকার করেই তিনি নিজের একান্ত আপন কাব্যজগৎটি রচনা করেছেন।"* [১৩]

অশোকবিজয়ের কবি-মানস গড়ে ওঠার পেছনে রবীন্দ্র-প্রভাব অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল। তবে কবিতায় সরাসরি রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষ করা যায় না।

রবীন্দ্র-প্রতিভার ব্যাপকতা ও কবি-সত্তার সঙ্গে অশোকবিজয়ের কবি-প্রতিভার তুলনা না করাই সমীচিন। শৈশবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সূত্র ধরে কবিতার প্রতি অশোকবিজয়ের আগ্রহ জন্মায়। এরূপ আমৃত্যু তাঁর কবি-জীবন ও ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী পালন, রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা পাঠিয়ে আশীর্বাদ লাভ, রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লাভ প্রভৃতি তাঁর প্রথম জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য শান্তিনিকেতনে এসে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। সেখানেও বাকি জীবনে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তাঁর চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছেন। কাজেই জন্মগতভাবে যে সংস্কার নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তায়-চেতনায় গভীরভাবে ছাপ ফেলেছেন। শুধু কবি হিসেবে নয়, সামগ্রিক জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে অশোকবিজয় হয়ে উঠেছিলেন রাবীন্দ্রিক।

তথ্যসূত্র :

১। 'পত্রাষ্টক', অশোকবিজয় রাহা, ভারবি সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা ৭০।
২। তদেব, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।
৩। 'অশোকবিজয় রাহা', অমল পাল, ২০ মে ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১১।
৪। 'যেথা এই চৈত্রের শালবন', অশোকবিজয় রাহা, ৮ মে ১৯৬১, পৃষ্ঠা ১১।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১১।
৬। 'অশোকবিজয় রাহা' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫।
৭। 'পত্রাষ্টক', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩।
৮। 'অশোকবিজয় রাহা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬।
৯। উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, 'কবি-প্রণাম', লালমাটি সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা ২০-২১।
১০। 'উত্তরকথা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১।
১১। 'উত্তরকথা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০।
১২। 'পত্রাষ্টক', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩।
১৩। 'আমার কালের কয়েকজন কবি', জগদীশ ভট্টাচার্য, আগস্ট ২০০৪, পৃষ্ঠা ২০২।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অমল পাল : 'অশোকবিজয় রাহা', ২০ মে, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-২০।
২। অশোকবিজয় রাহা : 'যেথা এই চৈত্রের শালবন', ৮ মে ১৯৬১, প্রকাশক অশোকবিজয় রাহা, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।
৩। অশোকবিজয় রাহা : 'পত্রাষ্টক', ভারবি সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, ভারবি, কলকাতা-৭৩।
৪। উষারঞ্জন ভট্টাচার্য (সম্পাদক) : 'কবি-প্রণাম', লালমাটি সংস্করণ ২০১৫, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা- ৭৩।
৫। জগদীশ ভট্টাচার্য : 'আমার কালের কয়েকজন কবি', আগস্ট ২০০৪, ভারবি, কলকাতা- ৭৩।